# বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা
## : আধুনিক যুগ :

নির্দিষ্ট কোনো ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি কখনোই শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ভাষার উৎকর্ষ এবং ওই ভাষা ব্যবহারকারী জনমণ্ডলীর বিজ্ঞান অনুশীলনের ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ ওই জনমণ্ডলী যদি ~~বিজাতীয়~~ বিদেশী কোনো ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান অনুশীলন করতে বাধ্য হয় তাহলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করা সত্ত্বেও তাদের মাতৃভাষা স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। সাহিত্য মূলতঃ রচিত ও পঠিত হয় মানুষের মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে তাই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যম হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলেও যে কোনো ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ লাভের পথে প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের জগৎ সব সময়ে বস্তুতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যেই নির্দিষ্ট একটা পাঠক্রমকে সামনে রেখে বিজ্ঞানের অনুশীলনের পথে অগ্রসর হয়। সেই জন্যেই নির্দিষ্ট কোনো ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার রূপরেখা অঙ্কিত করতে গেলে সেই ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রে কি স্থান অধিকার করে আছে তা সর্বাগ্রে পর্যালোচনা করতে হয়।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মূলত ইউরোপীয় মিশনারীদের সহায়তায় ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়ে আমাদের দেশের মাটিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছিল। বণিকের ছদ্মবেশে ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় যখন প্রথম এদেশে এসেছিল তখন তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন ও শোষণ করা। তাই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের তেমন কোনো গরজ তাদের ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বিরাট ভূখণ্ডে পাকাপাকি ভাবে শোষণ ও লুণ্ঠনের রাজত্ব কায়েম করে এই দেশের মানুষদের পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করার উদ্দেশ্যে তারা চেয়েছিল এখানে এক সার্বিক দমন মূলক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে। এই শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে যে সব ইংরাজ কর্মচারী এদেশে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের কাছে এদেশের ভাষা,

রীতি-নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই সমস্ত ইংরেজ কর্মচারীদের নানাদিক থেকে এই দেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলার জন্যেই লর্ড ওয়েলেসলির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। বাংলা সহ বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষা এবং এদেশের রীতি নীতির সঙ্গে পরিচিত শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম কেরীকে এই কলেজের ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই উইলিয়াম কেরী ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ ও যথার্থ মানবপ্রেমিক। তাই শুধু মাত্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপনার মধ্যেই তিনি নিজের কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা টানতে পারেন নি। আন্তরিকভাবে তিনি চেয়েছিলেন এদেশের মানুষকেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে। তাই তাঁর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এদেশের বুকে পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি জোয়ার এনেছিল। আর উইলিয়াম কেরীর ইচ্ছানুযায়ীই এই জোয়ারের স্রোতে আমরা আমাদের মাতৃভাষার নৌকো বেয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার ঘুদ কুড়ো আহরণের সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরা যাতে আমাদের এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি সে দিকেও কেরী সাহেবের ছিল তীক্ষ্ণ নজর। তাই শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন নি। বাংলা মুদ্রণ ফন্ট বসিয়ে, বিভিন্ন পাঠ্য বই ছেপে তাঁরা একদিকে যেমন এই শিক্ষা বিস্তারের কাজকে ত্বরান্বিত করেছিলেন তেমনি বাংলা গদ্যকে ঋজু ও সাবলীল করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কেরীর এই মহান কর্মযজ্ঞে দেশী বিদেশী নির্বিশেষে কিছু মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন। রেভারেন্ড মে সাহেবের নেতৃত্বে চুঁচুড়ার একদল মিশনারী সোসাইটি বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নবপ্রবর্তিত শিক্ষাকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করার জন্যে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। সব মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও নিরবচ্ছিন্ন চর্চার মাধ্যমে বাংলা গদ্যকে সুগঠিত করে তার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বপ্রিয় দোষও বিজ্ঞান। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত

শিক্ষা ব্যবস্থার হাত ধরে আমাদের দেশের শিক্ষানুরাগীদের চোখ আধুনিক বিজ্ঞানের রঙীন আলোর প্রতিও আকৃষ্ট হলো। শুরু হলো মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ের অনুশীলন। মাতৃভাষায় রচিত হলো বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক। শ্রীরামপুর মিশনের ব্যবস্থাপনায় ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে দিগ্‌দর্শন নামে প্রথম যে সাময়িক পত্রটি প্রতিমাসে প্রকাশিত হতে থাকল তাতে ইতিহাস ভূগোল, সাধারণজ্ঞান বিষয়ক রচনার সঙ্গে নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ও সংকলিত হন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা ভাষায় প্রণীত উন্নত মানের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল "বিদ্যাহারাবলী" (১৮১৯ সালে আংশিক ভাবে এবং ১৮২০ সালে পূর্ণাঙ্গ রূপে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়)। উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্সকেরী ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানি-কার (৫ম সংস্করণ) অংশ বিশেষ নব গঠিত এবং অসংহত বাংলা গদ্যের মাধ্যমে অনুবাদ করে বিদ্যাহারাবলী প্রণয়ন করে শুধু বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার শুভ সূত্রপাতই করলেন না, সেই সঙ্গে বাংলাগদ্যের ভারবাহী ক্ষমতাকেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রমান করে দিলেন। অ্যানাটমির জটিল তত্ত্ব সমন্বিত উন্নতমানের এই অনুবাদ কর্ম আজও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার দাবী রাখে। এছাড়া এর সমসাময়িক কালে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী যে সমস্ত পাঠ্য পুস্তক বাংলা গদ্যে রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার লক্ষণীয় উদাহরণ বর্তমান। এই ধরণের পুস্তকাবলীর মধ্যে ভূগোল বিষয়ক রচনা সমূহের কথাও উল্লিখিত হতে পারে। কারণ এই সব ভূগোল বিষয়ক রচনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হয়। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে এই ধরণের যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের "জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়" (২য় সংস্করণ ১৮১৯) এবং কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত ছয় খণ্ডে বিভক্ত উইলিয়াম হপকিনস্ পিয়ার্সের "ভূগোল বৃত্তান্ত" (১৮১৯) স্মরণীয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এভাবে বাংলা গদ্যের বিকাশ, বাংলা গদ্যের মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্প্রসারিত হওয়ার পথে যে মিলিত অগ্রগতির সূচনা হয়েছিল তা পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যেই দারুণভাবে ব্যাহত

হওয়া' ইংরেজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষা এবং বিজ্ঞানচর্চার জগৎ থেকে সে একরকম নির্বাসিত হয়েই রইল।

প্রথমে উদাসীন থাকলেও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী শাসক সর্বপ্রথম এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সরাসরি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এই সালে প্রকাশিত charter Act বা সনদ আইনের ৪৩ নং ধারায় তদানীন্তন সরকার এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেন। তবে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা এই টাকা জনশিক্ষায় ব্যয় করারই পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে "জন - সাধারণের অজ্ঞতার ওপরে নয় তাঁদের শিক্ষার ওপরেই সরকারের শক্তি নির্ভর করে।" উপরন্তু তিনি এও মনে করতেন যে, শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শন অথবা তাতে সাহায্যের অজুহাতে সরকারের উচিৎ নয় তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করা। কিন্তু লর্ড ময়রার এহেন উদারতা লন্ডনস্থ "কোর্ট অব ডিরেক্টর" - দের আদৌ মনঃপুত হয় নি। কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের প্রকৃত মনভাব টলস্টয়ের -

"The Strength of the government lies in the people's ignorance and the government know this and will always oppose true enlighenment .."

'এই বিখ্যাত উক্তিটিরই অনুরূপ ছিলো [বিদেশী শাসকদের শিক্ষানীতি আলোচনা কালে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা (শিক্ষা সংস্কার) প্রবন্ধে টলস্টয়ের এই উক্তিটি উধৃত করেছিলেন। তাই নিজেদের পছন্দ মতন এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা নির্ণয় তথা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে তাঁরা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই General - commission of Public Instruction নামে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন committee. গঠন করেন। এই কমিটি সর্বপ্রথম এদেশে নব প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কোন ভাষাকে গ্রহণ করা উচিৎ তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছর কমিটির সদস্যরা এ বিষয়ে সর্ববাদী সম্মত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। উপরোক্ত মনরো, এলফিন্‌ - স্টোন, কেরী মার্শম্যান, অ্যাডাম প্রমুখ দূরদর্শী বিদেশী শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাভাষাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে কমিটির কাছে

দাবী পেশ করেন। উইলিয়াম কেরী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই এক লিখিত প্রস্তাবের মাধ্যমে এই কমিটির সভাপতি মিঃ হ্যারিংটনকে এদেশের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জন্যে জাতীয়-শিক্ষা প্রবর্তনের এবং দেশীয় ব্যক্তিদের মাতৃভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু মিঃ হ্যারিংটন নেটিভ দের কল্যাণে তাঁর উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত "Downward filtration theory" র (নিম্নমুখী পরিস্রুতি মতবাদ) মাধ্যমে এই দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন যে, প্রথমে কিছু ছাত্রকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে করে পরবর্তী কালে তারা ইংরাজী ভাষায় লিখিত বিভিন্ন পুস্তক অনুবাদ করে নিম্নকোটীর মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর অর্জিত জ্ঞান বিদ্যা ও শিক্ষাকে যদি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের উপরে ফল্গুধারার মতন চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফেলা যায় তাহলেই এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নতি ঘটবে। কিন্তু বেশ কিছু সদস্যের আপত্তি ও বিভিন্ন মহলের প্রতিরোধে তিনি তাঁর এহেন দমন মূলক ইচ্ছাকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন নি। একরকম ব্যর্থ মনোরথ হয়েই শেষ পর্যন্ত তিনি এই কমিশনের সভাপতির পদ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করেছিলেন কমিশনের দ্বিতীয় সভাপতি লর্ড ম্যাকলে। এদেশের ঐতিহ্য মন্ডিত ভাষা, সাহিত্য তথা ইউরোপীয় সভ্যতা বিকশিত হওয়ার বহু আগে থেকে গড়ে ওঠা এবং যুগ যুগ ধরে বহন করে নিয়ে আসা ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্যকে দুর্বিনীতের মতন অপমান করে মেকলে ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি মিনিট রচনা করেন এবং অবাস্তব ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের মাতৃভাষার সমস্ত দাবীকে উপেক্ষা করে এদেশের শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষাকে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন। আর ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, মেকলের এই সুপারিশ অনুযায়ী এক নির্দেশ জারি করে " মাতৃ অঙ্গন থেকে মাতৃভাষাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয়" করার কাজকে সুসম্পন্ন করেন। তাঁদের হঠকারী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়ার ফলে সেই এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদেশী ভাষার

99195
- 2 JAN 1989
NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR

চৌকাঠে হোঁচোট খেয়ে ও বিজ্ঞানের ন্যূনতম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে বংশানুক্রমিক ভাবে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

তবে আনন্দের কথা এই যে, এত চক্রান্ত করেও "আমরি বাংলা ভাষা" কে বিজ্ঞান চর্চার জগৎ থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা গেল না। কারণ এই দমন মূলক আইন দেশী বিদেশী দূরদর্শী কিছু শিক্ষানুরাগীর মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল সেই ক্ষোভই বাড়তে বাড়তে জন্ম দিল এক মহান আন্দোলনের। এই আন্দোলনের সামিল হয়ে কোন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন। অন্যথায় বেশ কিছু শিক্ষা দরদী ব্যক্তি ও সংগঠন বিজ্ঞান চর্চা তথা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নানান যুক্তির সাহায্যে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্বোক্ত গোষ্ঠীর মনোবলকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিলেন।

আর তাঁদের এই ধরণের কার্যকলাপ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে এমন ভাবে প্রভাবিত করল যে, সেই কার্যকলাপের আলোচনা ব্যতিরেকে আজ সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কন করা মানে ইতিহাসের অবমাননা করা। তাই পূর্বোক্ত গোষ্ঠীর রচনাবলীর বিশ্লেষণ ও আলোচনার প্রাক্কালে যে সব ব্যক্তি ও সংগঠন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব থেকে জেনারেল কমিশন গঠিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং যাঁরা ঐ কমিশন গঠিত হওয়ার পর থেকে বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের মাতৃভাষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের কার্যকলাপের কিছু উদাহরণ এখানে সন্নিবেশিত হচ্ছে।

## শ্রীরামপুর মিশন : উইলিয়ম কেরী ও জশুয়া মার্শম্যান:

ঊনিশ শতকের প্রথম পর্বে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষা বিস্তারকে সম্প্রসারিত করতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারীরা। এই মিশন, বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারের যে পরিকল্পনা

নিয়েছিলেন সেই পরিকল্পনাকে সার্বিক ভাবে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য তাঁরা পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ করার পুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁরা নিজেদের চেষ্টাতে বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র বসিয়ে ও নানান পাঠ্য পুস্তক দেশে শিক্ষাকে জনমুখী করার উদ্দেশ্যে এক বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র ১৮১৬ সালেই মিশন কর্তৃপক্ষ পাঠ্য পুস্তক রচনা ও মুদ্রণের জন্য পাঁচশো টাকা ব্যয় করেন। তাঁদের উদ্যোগে ১৮২৯ সালের মধ্যে ভাষাশিক্ষা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ২৭টি বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'পদার্থবিদ্যা সার' (১৮২৫), 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৯৩৩)', ক্রিয়া বিদ্যাসার' (১৮৩৪) বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এককথায় শিক্ষা বিস্তার, বাংলা পদ্যকে সুসংহতরূপে গঠন ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে সম্প্রসারিত করার এক ত্রিমুখী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শ্রীরামপুর মিশন আন্তরিক ভাবেই তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা এও বুঝেছিলেন যে, শুধুমাত্র গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চাকে সঠিকভাবে সম্প্রসারিত করা যাবে না। বিজ্ঞানের শিক্ষাকে অধিক সংখ্যক মানুষের মনে পৌঁছে দেবার জন্য এবং বাংলাপদ্যকে বিজ্ঞানের ভার বহনে উপযুক্ত করে তোলার জন্য জনমুখী কোন মাধ্যমের সাহায্যে বিজ্ঞান চর্চার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে। তাই ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিগ্দর্শন' নামক সাময়িক পত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হত। সুতরাং আজ একথা বলতে অত্যুক্তি হয় না যে, শ্রীরামপুর মিশনারীরাই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সুরম্য মিনারটির আদি স্থপতি।

উইলিয়ম কেরী ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ। মূলতঃ তাঁর নেতৃত্বেই শ্রীরামপুর মিশন উপরোক্ত ত্রিমুখী কর্মসূচী রূপায়ণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে

সক্ষম হয়েছিল। আর উইলিয়াম কেরী ঠিক সব্যসাচীর মতনই একদিকে শিক্ষা বিস্তারের ও অন্য দিকে বাংলা গদ্যকে সাবলীল করার কাজকে অসামান্য তৎপরতায় একই সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় যে সত্যসত্যই তিনি এদেশের মানুষের যথার্থ কল্যানের কথাই চিন্তা করতেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে প্রসারিত করার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে অনেক কাজই তিনি করেছিলেন। মাতৃভাষাকে এদেশের শিক্ষার মাধ্যম হিসাব গ্রহণ করার এবং তার মাধ্যমেই বিজ্ঞানসহ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের চর্চাকে অব্যাহত রাখার পক্ষে সব সময়েই তিনি তাঁর দৃঢ় মতামত প্রকাশ করতেন। এমনকি এই মতামতের পক্ষে তিনি সরকারী নীতির সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেন নি। ১৮২৩ সালে ১৩ই নভেম্বর, কেরী, জেনারেল কমিশনের সভাপতি হার্ডিঞ্জের কাছে একটি লিখিত পত্রের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের এবং দেশীয় ব্যক্তিদের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবী জানান। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর দাবীকে উপেক্ষা করে Downward filtration নীতির প্রবক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সালে মারা যান। ১৭৯৩ সালে তিনি প্রথম এদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন। তাঁর জীবন ছিল সদা কর্মব্যস্ত। তাঁর চেষ্টায় এদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করেছে। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাটা বেনিভলেন্ট সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর রচিত কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাস মালা (১৮১২) বাংলা ইংরাজী অভিধান (১৮১২) প্রভৃতি গ্রন্থ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

উইলিয়াম কেরী ছাড়া শ্রীরামপুর মিশনের অন্য যে সব কর্মকর্তা মাতৃভাষায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চাকে সম্প্রসারিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ জেশুয়া মার্শম্যানের নাম ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্পাদনাতেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'সমাচার দর্পণ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।

তিনি ছিলেন এই মিশনের অন্যতম প্রধান কর্ণধার। ইংলণ্ডের মিশনারী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত এক মিনিটে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া আধুনিক জ্ঞানের আলোক এদেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। ১৮১৬ সালে আলোচ্য মিনিটের ওপর ভিত্তি করে তিনি যে পুস্তকটি প্রকাশ করেন সেটির নাম: "Hints : relative to the native schools together with the outline of an institution for their expansion and management" — সে সময় যাঁরা ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন এই পুস্তিকায় তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়। এখানে ডাঃ মার্শম্যান দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে এদেশের মানুষকে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী বা অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত করার চেষ্টা চালানো এক উন্নত ধরণের প্রতারণারই নামান্তর। তাই জনগণকে যদি প্রকৃত শিক্ষিত করে তুলতে হয় তবে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই নয়, উচ্চশিক্ষার স্তরেও বিজ্ঞান সহ অন্যান্য বিষয়ের পঠন - পাঠনে বাংলা ভাষাকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ১৮৩৭ সালে ডাঃ মার্শম্যান ইহলোক ত্যাগ করেন। বস্তুতঃ পক্ষে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে শ্রীরামপুর মিশনের কর্মযজ্ঞ বেশ কিছুটা ক্ষীণ হয়ে যায়।

রবার্ট মে :

লণ্ডন মিশনারী সংস্থার চুঁচুড়া শাখার অন্যতম কর্মকর্তা রবার্ট মে এদেশে জনশিক্ষা বিস্তারে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিক্ষাদানের পরিবর্তে বা শিক্ষা দানের অছিলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। তাই ১৮১৪ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি চুঁচুড়া সেন্ট্রাল স্কুল নামে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাইবেল বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থকে পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশীয় জনগনের মনকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই স্বল্প সময়ে তাঁর এই স্কুলটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে তিনি আরও অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সমসাময়িক কালে তিনি

চুঁচুড়া অঞ্চলের গভর্ণমেন্ট স্কুল সমূহের পরিদর্শক পদেও নিযুক্ত হন। উপযুক্ত পাঠ্য - পুস্তক ছাড়া যে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার অসম্ভব একথা তিনি জানতেন এবং বুঝতেন। বিশেষ করে ছাত্রদের বাংলা ভাষার মাধ্যমে গণিত চর্চা করার সমস্যাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তাই তিনি ' অঙ্কপুস্তকং' (১৮১৭) রচনা করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে গণিত চর্চার ইতিহাসে আদি পুরুষ রূপে নিজের স্থান করে নেন এবং 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' থেকে প্রকাশিত ' অঙ্কপুস্তকং'- ও এই ইতিহাসের প্রথম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ডেভিড হেয়ার :

হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে প্রবল আলোড়ন এসেছিল, ডেভিড হেয়ার ছিলেন সেই হিন্দু কলেজের " আদি কল্পক"। সম্ভবত ১৮০০ সালে ডেভিড সাহেব সর্বপ্রথম এদেশের পদার্পণ করেছিলেন। ঘড়ি নির্মাণের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তিনি তদানীন্তন কালে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করেন। কিন্তু ব্যবসাদারীর সীমিত গন্ডিতে তিনি কোন দিনই আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী তাই এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য হেয়ার সাহেব যথেষ্ট সংগ্রাম করেছিলেন। সাধারণত নীরবে কাজ করে যেতেই তিনি ভালবাসতেন। ১৮১৮ সালে 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' নামক যে সংগঠনটি জন্ম নিয়েছিল ডেভিড সাহেব সেই সংগঠনেরও প্রতিষ্ঠা কালীন সদস্য ছিলেন। সিমলা পাঠশালা, আরপুলি পাঠশালা, পটলডাঙ্গা স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে তিনি অনেক সময়ে নিজের অর্জিত অর্থ ব্যয় করতে ও কুন্ঠিত হন নি।

১৭৭৫ সালে ডেভিড সাহেব স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রদরদী, শিক্ষাব্রতীও জনসেবক হিসাবে তিনি এদেশের মানুষের কাছ থেকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। নিজের পাল্কিতে ওষুধের ব্যাগ নিয়ে তিনি ঘোরাফেরা করতেন এবং দরকার মতন অসুস্থ ব্যক্তিকে

সেই ওষুধ দিয়ে তাঁর যন্ত্রণা লাঘব করতে চেষ্টা করতেন। তাই কলকাতাতে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর অনুগামী ছাত্ররাই সামাজিক অনুশাসনকে উপেক্ষা করে মেডিকেল কলেজের শব ব্যবচ্ছেদের সুযোগে সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৩৭ সালে মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা কালীন অধ্যক্ষ ব্রামলির মৃত্যু হলে ৪০০ টাকা বেতনের বিনিময়ে (অফিস পরিচালনার খরচ সমেত) ডেভিড সাহেবকে মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি বেতন অস্বীকার করেন। ১৮৪১ সালে পর্যন্ত অবৈতনিক সেক্রেটারী হিসাবে এই কাজ চালিয়ে যান। কলেজ পরিচালনার জন্য এই কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপকদের নিয়ে যে কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তিনি সেই কাউন্সিলের সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত হন। এই পদে আসীন থাকা কালীন ডেভিড সাহেব বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটা যুগান্তকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন - পাঠন চালু করার উদ্দেশ্যে ১৮৩৯ সালে মেডিকেল কলেজে 'হিন্দুস্থানী শ্রেণী' খোলা হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার পথটা প্রশস্ত হয়।

সংস্কৃত কলেজ (কলিকাতা):

সংস্কৃত কলেজ তার জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এই কলেজকে কেন্দ্র করে প্রথমে আমাদের দেশীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল সে আন্দোলনে বাংলা ভাষার তেমন কোন স্থান ছিল না।

১৮২৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রধানতঃ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীটে একটি ভাড়া করা বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮২৬ সালের ১লা মে এই কলেজ তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমাবধি বেদান্ত, জ্যোতিষ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ের পঠন - পাঠন প্রচলনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই কলেজ তার কাজ

আরম্ভ করেছিল। দু বছর পরে এখানে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুর্বেদের পঠন - পাঠন চালু করার জন্য একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১৮২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭ জন ছাত্র নিয়ে এখানে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হয়। সংস্কৃত কলেজের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ পঠন - পাঠন করার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার জন্যই আমাদের দেশের জাতীয় বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ দ্রুত অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাই সংস্কৃত কলেজের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সেই অবক্ষয়কে রোধ করার তথা আমাদের দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বিজ্ঞান চর্চার ধারাকে পুনঃ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এই ভাবে সংস্কৃত কলেজে আমাদের দেশীয় বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হওয়ার শুভলগ্নে মাতৃভাষাকে মাধ্যম করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। কারণ ওই কলেজের অধ্যাপকরা আয়ুর্বেদের বিষয় সমূহের আলোচনা সংস্কৃতের মাধ্যমে এবং আয়ুর্বেদের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে করতেন।

১৮২৭ সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী বিভাগ খোলার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন দানা বাঁধে এবং পরবর্তী কালে ছাত্র - আন্দোলনের জন্যই এখানে (১৮৩৫ সাল) ইংরাজীর পঠন পাঠন সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় (১৮৪২ সালে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে ইংরজীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়)। এই সুযোগে, ১৮৩৯ সালে আমাদের মাতৃভাষা বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার পায়।

১৮৩৮ সালের ৩১শে আগস্ট সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রামকমল সেন এই কলেজের ছাত্রদের বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাটীগণিত ও পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের কাছে যে লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন তাতে বলা হয়ঃ

" It thinks also that the various works on European natural philosophy, Glography and History, translated into Bengali, should be studied in class and that Provision should be made for instruction in the Regulations - - - -[2]

মূলত এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ১৮৩১ সালের ১১ই মার্চ এই কলেজে পদার্থ বিদ্যা ও পাটীগণিত বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাসিক ৮০ টাকা বেতনে ইংরেজী বিভাগের প্রাক্তন একজন অধ্যাপককে নিযুক্ত করা হয় এবং এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই সংস্কৃত কলেজ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে নিজের স্থান করে নেয়।

কিন্তু বিদেশী সরকারের মাতৃভাষার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলেই ১৮৪২ সালের ২৮ শে এপ্রিলের পর এই বিভাগের কাজ কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর বিদেশী সরকার সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর বিলোপ সাধন করে আমাদের দেশীয় বিজ্ঞানের চর্চাকেও ভীষণ ভাবে ব্যাহত করেন।

## ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি :

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে এদেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটিয়ে ও বাংলাভাষাকে বিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই সোসাইটির উদ্যোগেই 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯) 'ঔষধ সার সংগ্রহ' (১৮১৯) 'পদার্থ বিদ্যাসার' (১৮২৪), 'ওলাওঠার বিবরণ' (১৮২৬), 'পশ্বাবলী' (১৮২৮) প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং বাংলা ভাষা বিজ্ঞান আলোচনার মাধ্যম হওয়ার যোগ্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়।

জন্মলগ্ন থেকেই সম্পূর্ণভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই সংস্থা এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। 'কাউন্টেস অব লন্ডন এন্ড্ ময়রা' আন্তরিক ভাবে এমন এক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, যে সংগঠন আমাদের মাতৃভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করে শিক্ষা বিস্তারের কাজকে ত্বরান্বিত করবে। ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি কেরী ও টমসনকে তাঁর এই সদিচ্ছার কথা

প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে কেরীর কর্ম তৎপরতায় ক্যালক্যাটা স্কুল বুক সোসাইটি গঠিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ১৮১৭ সালের মাঝামাঝি গঠিত এই সোসাইটির প্রথম সভা বসে ৮ই জুলাই (১৮১৭) তারিখ। ১৬ জন ইউরোপীয় এবং ৮ জন দেশীয় ব্যক্তি নিয়ে এই সোসাইটির যে পরিচালক মন্ডলী গঠিত হয় তাতে স্যার হাইড্ ইষ্ট জে, এম, হ্যারিংটন, ডবলিউ, বি, বেলী (সভাপতি), উইলিয়ম কেরী, রেভারেন্ড জে, পিয়ার্সন, রেভারেন্ড টি, টমসন, মেজর জে, ডবলিউ টেলর, ক্যাপ্টেন টি রোবাদ, ক্যাপ্টেন এ, লকেট, ডবলিউ, এইচ ম্যাকনাটন, জি, জে, গর্ডন, জে রবিনসন, জে, ক্যালডের (কোষাধ্যক্ষ), লেফটন্যান্ট পি, আরভিন (সম্পাদক), ই, এস, মন্টেগু (সম্পাদক), লেফটন্যান্ট ডি, ব্রাইস, মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ(সম্পাদক); তারিনী চরণ মিত্র (সম্পাদক); মৌলভী করম হোসেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মৌলভী আবদুল হামিদ, রাধাকান্ত দেব, মৌলভী রসিদ এবং রামকমল সেন সদস্য মনোনীত হন। (১৮৩০ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী দ্বারকানাথ ঠাকুরকে এই সোসাইটির সভ্য মনোনীত করা হয়) ১৮১৭ থেকে ১৮২১ সালের মধ্যে স্কুল বুক সোসাইটির প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মোট ৪৪ টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই ৪৪ টি গ্রন্থের মোট মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ১,২৫,৪৪৬ কপি। এগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষাতে ১৩টি গ্রন্থ(মোট কপি ৭৯,৭৫০) এবং ইংরাজি ভাষায় ৪টি গ্রন্থ (মোট কপি ৪,৮২২) প্রকাশিত হয়। (উপরোক্ত ৪২টি গ্রন্থের মধ্যে ১২টি গ্রন্থের প্রকাশনায় দায়িত্ব শ্রীরামপুর মিশন ও সোসাইটি যৌথভাবে পালন করে)। এককথায় স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার লগ্নে মূলত বাংলা গ্রন্থকে অবলম্বন করেই তার নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এইসব গ্রন্থাবলীর কিছু কিছু বিনামূল্যে এবং কিছু কিছু স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে বিতরণ করা হত। সে সময়ে বাংলা গ্রন্থের প্রচুর চাহিদা ছিল বলে অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের থেকে বাংলা গ্রন্থ সমূহই বেশী পরিমাণে বিক্রিত ও বিতরিত হত। তাই বাংলা গ্রন্থ অবিতরিত বা অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকত না বলাই চলে ।

কিন্তু শিক্ষা জগতে বাংলা বিরোধী সরকারী নীতির করাল ছায়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুল বুক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল তা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করল। ১৮৩৪ - ১৮৩৫ সালে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, এই সময়ে সোসাইটি মোট ৪০ টি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাত্র ৭টি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এবং ৭ টি গ্রন্থ ইংরেজি বাংলার সমন্বয়ে রচিত। ১৮৩৬ সালের ৩০ শে এপ্রিল স্কুল বুক সোসাইটির এক রিপোর্টে সরাসরি ভাবে ঘোষণা করা হয় যে পূর্ব অনুসৃত রীতির বদল ঘটিয়ে সোসাইটি ইংরেজী ভাষায় রচিত পুস্তক প্রকাশের বিষয়টিকে বেশী গুরুত্ব দেবে। সোসাইটির এই ধরণের নীতির পরিবর্তনে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতিতে যে ক্ষতি হয় আজও সর্বাংশে তা পূরণ করা যায় নি।

রাধাকান্ত দেব :

ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উদার চিন্তার অভাবের জন্য রাধাকান্ত দেবের কোন কোন কার্যকলাপ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল বলে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই ভূমিকা সর্বক্ষেত্রেই প্রশংসা অর্জন করেছিল। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সর্বতোমুখী কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল সেই যজ্ঞকে সার্থক করতে রাধাকান্ত অনেক আহুতি দিয়েছিলেন। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বঙ্গভাষানুবাদ সমাজ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সদস্য। বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞান চর্চাকে সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি যথেষ্ট সংগ্রাম করেন। কারণ রাধাকান্ত দেব বুঝেছিলেন যে মাতৃভাষা যদি শিক্ষার মাধ্যম না হয় তবে শিক্ষাকে

যেমন গণমুখী করা যাবে না তেমনি সমাজে শিক্ষিত - অশিক্ষিতের মধ্যে যে মানসিকতার ব্যবধান সৃষ্টি হবে সেই ব্যবধান দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। রাধাকান্তের এই চিন্তাধারা প্রসঙ্গে 'বাঙালী বুদ্ধিজীবি' ও ছিন্নমূলতা - বাদ' গ্রন্থে অমলেন্দু দে বলেছেন, ' তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমেই জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের বিষয়টা তিনি সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ স্বল্প ইংরেজি জ্ঞান সম্পন্ন যুবকদের কৃষি ও শিল্প থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাবে এবং তাদের সরকারি ও সওদাগরি অফিসে কেরানী হতে প্রলুব্ধ করবে। তাতে বেশীর ভাগ যুবকেরা হতাশায় ডুবে এবং ইংরেজি ভাষার স্বল্প জ্ঞান তাদের অহঙ্কারী করে তুলবে। তারা আর নিজেদের ব্যবসা বানিজ্য ফিরে আসতে পারবে না এবং ভবঘুরেতে পরিণত হবে।' — এত গেল পরোক্ষ দিক। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে সম্প্রসারিত করার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবেও রাধাকান্ত সচেষ্ট ছিলেন এবং তাই তিনি বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ও রচনা করেন।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ :

১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজী থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'জার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' বা 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' নামে যে প্রতিষ্ঠান জন্ম গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচিত ইংরেজি গ্রন্থ সমূহ অনুবাদ করে শিক্ষা বিস্তারের জন্য জনগণের কাছে বিক্রি করা অথবা ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা। এই প্রতিষ্ঠান গ্রন্থ প্রকাশ সংক্রান্ত তাঁদের নীতি প্রচার করার জন্যে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন তাতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছিল: "১ম পুস্তকখানি সুনীতি সম্পন্ন বা চরিত্র শোধক হইবেক। ২য় নিম্ন লিখিত বিষয়ে অথবা অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে ।

১। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞান শাস্ত্র ।

২। দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত ।

৩। বানিজ্য এবং লোকযাত্রা বিধান।

৪। লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান - শাস্ত্র ।

৫। শিল্প বিদ্যা।

৬। শিক্ষা বিধান ।

৭। জীবনচরিত ।

৮। নীতিগর্ভ গল্প (সূত্র : বাংলা সাহিত্যে গদ্য সুকুমার সেন।)[১]

আলোচ্য প্রতিষ্ঠান যথাযথ ভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যে বাংলাভাষা যদি এদেশের শিক্ষার মাধ্যম না হয় তাহলে এদেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ কখনোই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে না। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা বিস্তারের কাজকে তরান্বিত করতে এই সোসাইটি যে ভূমিকা পালন করেছিল সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা' গ্রন্থে ডঃ কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন "সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডিঃ এইচ প্র্যাট বলেছিলেন , ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের ওপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের দ্বারা এদেশীয় জনসাধারণকে ইউরোপের জ্ঞান সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং প্র্যাটের মতে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব জীবনকে উন্নত করার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও জনপ্রিয় সাহিত্য সম্ভার সকলের কাছে পৌঁছে দিলেই এই অন্যায় অবিচার রুদ্ধ করা সম্ভব হবে।'

তাই দেখা যায় সরকারী অনুদানের মুখাপেক্ষী না থেকে বঙ্গভাষানুরাগী সমাজ যেমন বিরাট আর্থিক দায়দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে বাংলা ভাষায় অনুদিত বিজ্ঞান ও অন্যান্য শিক্ষামূলক বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশ করে তার মুখ্য অংশ জনসাধারণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করে তেমনি আবার জীবতত্ত্ব ও বিজ্ঞান, ভূগোল, বানিজ্য, অর্থনীতি, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের মৌলিক রচনাকে উৎসাহ দেবার জন্য দু'শো টাকা করে পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নানান প্রতিকূল অবস্থার জন্য এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন একক ভাবে কাজ করার সুযোগ পায় নি। তাই ১৮৫২ সালে একটি স্কুল বুক

সোসাইটির সঙ্গে মিশে যায়। এই প্রতিষ্ঠানের এহেন অবলুপ্তি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্প্রসারণের কাজকে অনেকাংশে ব্যাহত করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁদের কয়েকজন উত্তরসূরী :

১৮৫৭ সালের ২৪ শে জানুয়ারী বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে চিহ্নিত। কারণ এই তারিখে স্থাপিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তদানীন্তন ভারত সরকারের নির্দেশে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রাধাপ্রসাদ রায় প্রমুখ বাঙালি শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পদস্থ রাজকর্মচারীদের নিয়ে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং General Committee of Public Instruction ও Council of Education এর কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে এদেশে শিক্ষা পরিচালনার কাজ সরাসরি তত্ত্বাবধান করতে থাকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞানের পঠন - পাঠনকে প্রথম থেকেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এন্ট্রান্স (১৮৫৭ সাল থেকে প্রবর্তিত) পরীক্ষার (পরবর্তী কালে এই পরীক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন নামে অভিহিত হয়।) পাঠ্যসূচিতে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও জীব বৃত্তান্ত এফ. এ(১৮৫৯ সাল থেকে প্রবর্তিত)পরীক্ষার (পরবর্তীকালে এফ.এ পরীক্ষা আই.এ.ও আই.এস.সি নামে পরিচিত হয়।) পাঠ্যসূচিতে জীব বিজ্ঞান, বি.এ (১৮৫৮ সাল থেকে প্রবর্তিত) পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতে জীব বিজ্ঞান, তরল পদার্থের স্থিতিশাস্ত্র ও গতি বিজ্ঞান, গ্যাস বিজ্ঞান, আলোক বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ণ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা প্রাকৃতিক ভূবিদ্যা, এম.এ (১৮৫৯ সাল থেকে প্রবর্তিত) পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও পদার্থ বিদ্যার পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল (১৯১৭ সাল থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক স্তরে পাঠ্য সূচীকে সম্পূর্ণ আলাদা করে বি.এস.সি. পরীক্ষা প্রচলিত হয়) কিন্তু প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ভাবে এদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চাকে অনুপ্রাণিত -

করলেও তার মাধ্যম রূপে বাংলাভাষাকে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ ১৮৫১ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা সমূহের মাধ্যম হিসেবে শুধু মাত্র ইংরেজী ভাষাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্প্রসারিত হওয়ার যে বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল সেই সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এদেশের জনগণ বংশ পরম্পরায় উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যান।

ইংরাজী ভাষাকে এই ভাবে শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শিক্ষা - বিতর্ক' কেন্দ্র করে তিনি সাধনা পত্রিকাতে (১৮৯২ - চৈত্র) একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার ও বিজ্ঞান চর্চা সম্প্রসারণ করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন " .... ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দুই দিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ বঙ্গভাষায় এমন সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমানে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্খা মিটে। ...." এছাড়া বাংলাভাষা যাতে বিজ্ঞান চর্চা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয় সে বিষয়ে তিনি সাধ্যানুযায়ী নানান চেষ্টা চালান ও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার সুপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি ও অবতারণা করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২১ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তখন থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষানীতি পরিবর্তনের জন্য নানান রকমের চেষ্টা চালান। ১৯২১ সালের ৭ই মে তিনি বাংলা ও আসামের উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান সহ ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার অন্যান্য বিষয়ের পঠন - পাঠন প্রনয়ণ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাঁরা ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা প্রচলনের সুপক্ষে মতামত দেন। কিন্তু নানা প্রতি বন্ধকতার জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।

পরবর্তী কালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপাচার্যের পদে আসীন হয়ে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। অনেক কাঠ - খড় পুড়িয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবটিকে তিনি কার্যকর করাতে পারেন ১৯৪০ সালে। কারণ ওই বছরই আশুতোষের প্রস্তাব প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে আইন হিসেবে বলবৎ হয়। কিন্তু এখানেও থেকে যায় আইনের এক মার প্যাঁচ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষাকে বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেই প্রস্তাবে লেখা হয় "Instruction and examination in all subjects other than English shall be conducted in the vernaculars"

কিন্তু যে কর্মীটি এই প্রস্তাব বিবেচনা করেন তাঁরা এই বক্তব্যকে নিজেদের মনের মতন সাজিয়ে নিয়ে লেখেন। "Unless otherwise provided answers papers in all subjects other than English and all other European languages shall be written in one or other of the major vernaculars. . ."

~~[illegible]~~ এই পরিবর্তিত report যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে আসে তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যদের এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে যে আবেগপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি এই আশাই প্রকাশ করেন যে, এমন একদিন আসবে যখন শিক্ষার সামগ্রিক ক্ষেত্রে ও বিজ্ঞানের চর্চায় বাংলাভাষাই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হবে।

যাই হ ক, এই ভাবে বাংলা ভাষা কোন গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে প্রবেশ করার সুযোগ পাওয়ায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার গতি একটু চাঙ্গা হয়। এর দীর্ঘ আট বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াসে I. A, I.Sc, B.A., B.Sc, এবং B.Com. পাঠ্যক্রমের পঠন - পাঠনের মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা প্রচলিত হয়। প্রমথনাথ বাবুর পর সত্যেন্দ্রনাথ

সেনের আমলে আবার বাংলা ভাষার মাধ্যমে M.A. এবং M.Sc. পরীক্ষার পঠন - পাঠন চালু করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা হয়। সূত্র:সুবর্ণ লেখা/১৯৭৪/ বাংলা বিভাগ/ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এছাড়া ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে সম্প্রসারিত করার জন্য পরিভাষা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন।এই পরিভাষা সমিতি প্রণীত পরিভাষা সমূহ সঙ্কলন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা গ্রন্থ ও প্রকাশ করেন। আর এভাবেই বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে যায়।

এ পর্যন্ত আলোচনা যে সব তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে সম্প্রসারিত হয়েছে তার থেকে এই বিষয়টা স্পষ্ট ভাবেই প্রমানিত হয়ে যায় যে এদেশের জনগণকে আধুনিক শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রাখার অভিপ্রায়েই বিদেশী রাজশক্তি জোর করে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত করেছিলেন। তাই প্রশ্নাতীত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। তবে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এই যে চক্রান্ত সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে দুই শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী মহলই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে বাংলাভাষাকে তার প্রাপ্য আসন ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট হন এবং এই আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে বিগত শতাব্দীতে 'বঙ্গদর্শন', 'সংবাদ - প্রভাকর,' 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর,' 'সংবাদ ভাস্কর,' 'সোমপ্রকাশ', 'ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ও পুরোধা হিসেবে ইতিমধ্যেই যাঁদের কথা এখানে আলোচিত হয়ে গিয়েছে, তাঁরা ছাড়া অন্যান্য যাঁরা এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন ও বিজ্ঞান চর্চার গতিকে অব্যাহত রাখতে বিশেষ ভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এই সব ব্যক্তির কার্যকলাপ সবিস্তারে বলতে গেলে এদেশের শিক্ষার ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনা করতে হয়। কিন্তু সেই আলোচনার অবতারণা করার সুযোগ এখানে নেই। তাই শুধুমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আনন্দ মোহন বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম স্মরণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত স্তরে বুদ্ধিজীবীদের অবদানকে স্বীকৃতি জানানোর কাজটা শেষ করতে হচ্ছে। এখানে প্রকাশ থাকে যে, এই সব স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই বাংলা ভাষাকে শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মূল্যবান মতামত প্রকাশ করে রাজশক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে আমাদের মাতৃভাষাকে বিজ্ঞানের ভার বহনের উপযোগী করে তোলার জন্যও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাই উপযুক্ত স্থানে যখন তাঁদের রচনাশৈলী সম্পর্কিত আলোচনা বিবৃত হবে, তখন তাঁদের কর্ম পদ্ধতির কিছুটা বর্ণনা দেওয়ারও সুযোগ পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এতক্ষণ যা আলোচিত হল তা শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুতের ইতিকথা। অর্থাৎ বিষয় বস্তুর বিচারে এটা গৌণ। মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন গ্রন্থ ও রচনার পরিমাণ ও উৎকর্ষ নির্ণয় তথা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনায় বাংলা ভাষার স্থান নির্ণয়। তাই এবার এই আলোচনার ভিত্তিতে এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ও রচনাদির পরিমাণ নির্ণয় তথা তাদের উৎকর্ষকে কেন্দ্র করে মূল আলোচনা সম্প্রসারিত হবে। তবে এই আলোচনার অবতারণা করতে গেলে প্রথমেই যে কথা স্বীকার করতে হবে তা হল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বাংলা ভাষায় শাখা ভিত্তিক বিজ্ঞান চর্চার যে বহুমুখী বহতা ধারা আপন বেগে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল আজ পর্যন্ত কোন প্রতিকূল শক্তিই সেই ধারাগুলোর সম্পূর্ণ গতিরোধ করতে পারে নি। কিন্তু এই কথা স্বীকার করতে গেলে যে প্রশ্নকে কিছুতে এড়ানো সম্ভব নয়, তা হল, এত কিছু সত্ত্বেও আমাদের মাতৃভাষা স্বাধীনতা লাভের ৩৮- বছর পরেও বিদ্যালয়ের স্তর ছাড়া অন্য কোথাও বিজ্ঞান চর্চার প্রধানতম মাধ্যম হিসেবে কেন গৃহীত হয় নি ? — আর এই কেনর উত্তর পেতে গেলে আমাদের মেনে নিতে হবে

নিম্নলিখিত বিষয়ের সত্যতাকে।

পরাধীনতার যেমন অভিশাপ আছে তেমনি আছে কিছু কিছু আশীর্বাদ। তাই পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য, ভাষা, শিক্ষা, তথা সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রা যেমন পরনিয়ন্ত্রিত হয়ে বিকৃত হতে থাকে, তেমনি সমগ্র জাতীয় জীবনে জেগে ওঠে অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম। স্বদেশ প্রেমের অনুপ্রেরণাতেই তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে নিজেদের জাতীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। এরকম ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা সুদূর প্রসারী। কেননা আপামর জনসাধারনেরই মাতৃভাষার ওপর একটা আন্তরিক দুর্বলতা থাকে। তাই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে কাগুজে সংগ্রামে অথবা প্রাথমিক স্তরের লড়াইয়ে সামিল হতে অতিবড় ভীরু-ও পেছপা হয় না। এধরণের সংগ্রাম ও লড়াই যে কালক্রমে সমস্ত দেশে জাতীয়তা বোধের কী প্রবল বন্যা বইয়ে দিতে পারে তা তো ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সত্যিকথা বলতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চাকে সম্প্রসারিত করার ব্যাপক চেষ্টা এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার সম্পর্কে গড়ে ওঠা জনমত কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আমাদের মনে প্রাণে উথলে ওঠা জাতীয়তা বোধের জোয়ারের একটা ঢেউ মাত্র। এই ঢেউয়েরই উত্থান - পাথাল যুগ সবচেয়ে ভাল ভাবে প্রকাশ পায় ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে দিকে দিকে যে আন্দোলন ধূমায়িত হয় সেই আন্দোলনকে ইন্ধন যোগান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন চন্দ্র পাল, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র নাথ বসু, তারক নাথ পালিত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। তাঁদের উৎসাহে ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ গঠিত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National council of Education)। বঙ্গভঙ্গ আইনের প্রতিবাদ স্বরূপ এই পরিষদের কর্মকর্তারা সোচ্চারে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ মুক্ত এক শিক্ষানীতি প্রচলন করার দাবীর স্বপক্ষে জনমত গঠন করতে

চাইলেন এবং ইংরেজীর শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জনের আহ্বান জানালেন। তাঁদের প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ নতুন এক ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে মানবিক, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্প্রসারিত করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০৬ সালের ১৪ই আগষ্ট "বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ এন্ড স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সাময়িক ভাবে (অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আইন প্রত্যাহৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত) তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাও এই শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে দ্বিধা বোধ করলেন না। অবশ্য পরবর্তী কালে উপযুক্ত সাংগঠনিক তৎপরতার অভাবে এই ধরণের প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হল না এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও রুজি রোজগারের কথা ভেবেই সবাই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ধরণের চেতনা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের দাবী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রূপ বদল করে মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামেরই একটি অঙ্গ হিসেবে আমাদের অনুপ্রাণিত করতে লাগল। কিন্তু যেই মুহূর্তে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ আমরা পেলাম, অমনি এই দাবীটার ধার অনেকটা কমে গেল। এক কথায় তখন কিছু শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বিচ্ছিন্ন দাবী হিসেবেই এটা পরিগণিত হল। ফলতঃ বিশেষ কোন অনুপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করার প্রবণতা কমে গেল এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার তটিনীতে এক প্রচুর পলি জমল।

ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের পর সমগ্র ভারতবর্ষে যে শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সেই শাসন ব্যবস্থার কাঠামো আমরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে কিছুটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া স্বরাজ আমাদের জাতীয় জীবনের কোন স্তরেই তেমন কোন আমূল পরিবর্ত্তন আনতে পারে নি। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রেও দেখা দেয়নি কোন বৈপ্লবিক পালাবদল। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী চালু হয়নি কোন জাতীয় শিক্ষানীতি। উপরন্তু শিক্ষিতের হার দিন দিন কমেছে। অথচ শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য একের পর এক কমিশন গঠন করা হয়েছে। সেই কমিশনের প্রস্তাব সমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে ছাত্র - ছাত্রী নামধারী গিনিপিগদের ওপর। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট একটি সময়

সীমা ধার্য করে বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার জন্য কোন কার্যকরী সরকারী সিদ্ধান্ত কোনদিনই গৃহীত হয় নি। ফলতঃ স্বাধীনতা উত্তর কালেও সহস্র সহস্র দেশবাসী আগের মতনই পুরুষানুক্রমে অশিক্ষার অন্ধকূপে ডুবে যাচ্ছে।

এ ছাড়া দীর্ঘ দেড় শতাব্দী ব্যাপী বিদেশী ধাঁচে এবং বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে করতে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যটা সম্পূর্ণ ভাবেই ইংরাজী ভাষার ছাঁচে ঢালাই হয়ে গিয়েছে। তাই আজও অধিকাংশ শিক্ষক এবং ভাল ছাত্র - ছাত্রী বিজ্ঞান পঠন পাঠনের উচ্চতর ক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার কথা কল্পনাই করতে পারেন না। দীর্ঘ অভ্যাসের জন্যে তাঁদের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ইংরাজীকে কেন্দ্র করে ঘোরা ফেরা করে। বিজ্ঞান চর্চায় এই ধরণের ইংরাজী নির্ভরতাও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধক ।

তবে উপরোক্ত বিষয় সমূহ অপেক্ষা বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অভাব জনিত সমস্যাটাই আজ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রধান-তম প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আর সবচেয়ে মজার কথা এই যে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান গ্রন্থের অভাব জনিত সমস্যাটি নিয়ে যে বিষয় দুটি আলোচিত হয় তা পরস্পর বিরোধী মন্তব্যে তৈরী একটি ধাঁধার মতন। এই ধরণের আলোচনার সারাংশ প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যেতে পারে।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে না কেন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে পঠন - পাঠন চালু করা যাচ্ছে না কেন ?

উত্তর : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ নেই বললেই চলে। তাই বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা স্তরে বিজ্ঞানের পঠন পাঠন চালু করা যাচ্ছে না ও এই ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে না।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী গ্রন্থ নেই কেন ?

উত্তর : বাংলা ভাষার মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে বিজ্ঞান চর্চা সম্প্রসারিত না হওয়ার এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে পঠন পাঠন চালু না থাকার জন্যই বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের এত অভাব। (অবশ্য এই সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর যে বিষয়টি বার বার উল্লিখিত হয় তা হল পরিভাষা জনিত সমস্যা। অনেকেই মনে করেন যে উপযুক্ত পরিভাষা না থাকার জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ এত কম রচিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'পরিভাষা' বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যাই নয়। তবে এখানে এই প্রসঙ্গে আলোচনা বিস্তারের অবকাশ নেই। তাই এই সমস্যাটি নিয়ে 'পরিভাষা' শীর্ষ নামাঙ্কিত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)।

এক কথায় উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার সম্প্রসারণ ও উচ্চশিক্ষা স্তরে পঠন - পাঠন চালু করতে গেলে এই ভাষায় রচিত যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু এই কথা বলা যত সহজ, বাস্তবায়িত করা তত সহজ নয়। আজ নানান দিক থেকে গ্রন্থ প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে যে কোন ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ করাই বর্তমানে অত্যন্ত ব্যয় বহুল ব্যাপার। তাই যে গ্রন্থের চাহিদা সীমিত সেই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ করে কোন প্রকাশকই ঝুঁকি নিতে চান না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মন্তব্যের সাথে বাংলাভাষায় লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার প্রতি পাঠকের আগ্রহ কম, এমন কোন কিছু প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ নিঃসন্দেহে প্রচুর বর্ষ সন্তানই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের রসাস্বাদনে আগ্রহী। কিন্তু তবে এঁদের অধিকাংশই বিজ্ঞান না জানা অথবা অল্প বিজ্ঞান জানা পাঠক। এঁরা সাধারণতঃ নিজেদের জ্ঞান তৃষ্ণা চরিতার্থ করা তথা বিজ্ঞান জগতের সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। অন্যথায় শিক্ষার মাধ্যমের ভিন্নতার জন্য ব্যবহারিক জ্ঞানবৃদ্ধি অথবা ডিগ্রী - ডিপ্লোমা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যাঁরা বিজ্ঞান পড়েন তাঁরা ইচ্ছা থাকলেও বাংলা ভাষায় লেখা গ্রন্থের সাহায্য তেমন নেন না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা যথাযথ ভাবে পাওয়া যায় না। তাই উচ্চতর ক্ষেত্রে শিক্ষার

প্রধানতম মাধ্যম না হওয়া পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার স্রোতে তেমন জোয়ার আসবে না। এই মন্তব্যের সত্যতা কতখানি তা বোঝা যায় শিক্ষার নিম্নতর স্তরের দিকে একবার তাকালেই। দীর্ঘদিন আগে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন - পাঠনের মাধ্যম হবার সুবাদে সে প্রকাশকদের কাছে তার অস্তিত্ব নেই। প্রতি বছর বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা উপরোক্ত দুই পাঠক্রম অনুযায়ী বাংলাভাষায় রচিত জীববিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা পদার্থ বিদ্যার প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। এই সমস্ত গ্রন্থাদির অধিকাংশের মানই সন্দেহাতীত ভাবে উন্নত। তাই বর্তমানে এই দুই স্তরে বিজ্ঞান পঠন পাঠনের জন্য সহস্র সহস্র ছাত্র ছাত্রী তাদের মাতৃভাষাকেই মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে। উপরন্তু স্নাতক স্তরের পাঠক্রম অনুযায়ী বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় রচিত কিছু বই পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্য-পুস্তক-পর্ষৎ সহ মুষ্টিমেয় প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ এর থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সার্থক ভাবে বিজ্ঞান আলোচনায় বাংলা ভাষার অযোগ্যতা অথবা বাংলায় লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অভাব বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা তথা উচ্চতর ক্ষেত্রে পঠন - পাঠন চালু করার পথে কোন প্রতিবন্ধক নয়। এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হল বাংলা ভাষাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দৃঢ় এবং ইতিবাচক কোন পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থতা। তাই যাঁরা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা তথা সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা-গ্রস্ত সবিনয়ে তাঁদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের " নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষা গ্রন্থ হয় কি উপায়ে ? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই পুলকিত হইয়া উঠিবে।" উক্তিটি এবং শিক্ষার মাধ্যম প্রসঙ্গে ১৯২৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর .... "আমার যদি স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার মত ক্ষমতা থাকিত, তবে আজই আমি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমাদের বালক বালিকাদের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতাম

এবং অন্যথায় কর্মচ্যুতির হুমকি দিয়া শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এখনই পরিবর্তন সাধনে বাধ্য করিতাম। আমি পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য অপেক্ষা করিতাম না। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অনুসৃত হইত (মাতৃভাষায় শিক্ষা। ডঃ কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য্য পৃঃ ২৭৫)" মন্তব্যটি স্মরণ করার অনুরোধ জানিয়ে ~~করিয়ে দিয়ে~~ ও এই প্রসঙ্গের ইতি টেনে ~~বাংলা ভাষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনায় কতটা সাফল্য অর্জন করেছে তা নির্ণয় করা যেতে পারে।~~ টানা যেতে পারে।